আয়ের বন্টন
(Income Distribution)

৭

একটি দেশের মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে হলে সে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের আয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ইউনিটে বাজার অর্থনীতিতে আয়ের বন্টন কিরূপ তা বর্ণনা করা হয়েছে। ইউনিটটির প্রথম পাঠে বর্ণিত হয়েছে সুদ, খাজনা ও মুনাফা নির্ধারণ প্রক্রিয়া। দ্বিতীয় পাঠে রয়েছে শ্রমবাজার ও মজুরী নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা।

এই পৃষ্ঠা খালিথাকবে

ইউনিট-৭

পাঠ-১: সুদ, খাজনা ও মুনাফা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আয়ের বন্টন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন
- প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সুদ, খাজনা ও মুনাফা কিভাবে নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

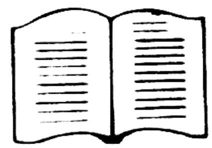

আপনি আগের ইউনিটগুলো থেকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের বাজারব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছেন। এ পাঠে জানতে পারবেন কিভাবে বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের দাম নির্ধারিত হয় এবং আয়ের বন্টন কিভাবে হয়।

আয় কী?

প্রতিটি মানুষই কোন না কোন উৎপাদনের উপকরণের মালিক। যেমন- শ্রমিক শ্রমশক্তির মালিক, মহাজন পুঁজির মালিক, ভূস্বামী ভূমির মালিক ইত্যাদি। মানুষ তার মালিকানাধীন উপকরণ বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা-ই তার আয়। যেমন শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে মজুরী পায়, ভূস্বামী ভূমি ভাড়া দিয়ে খাজনা পায়, পুঁজিপতি তার পুঁজি ধার দিয়ে সুদ পায় ইত্যাদি। এখানে শ্রমিকের আয় হচ্ছে মজুরী, ভূস্বামীর আয় হচ্ছে খাজনা, পুঁজিপতির আয় হচ্ছে সুদ, তেমনি উদ্যোক্তার আয় হচ্ছে মুনাফা। এখন চলুন, কোন্ শ্রেণীর মানুষের পকেটে কত টাকা যায় অর্থাৎ আয়ের বন্টন সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাক্।

আয়ের বন্টন

আপনি আগের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সমাজের মানুষগুলোকে উপকরণের মালিকানার ভিত্তিতে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- শ্রমিক, পুঁজিপতি, ভূস্বামী ও উদ্যোক্তা। তাহলে সমাজের কোন শ্রেণীর আয় কত হবে সেটা নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের উপর- ১। উপকরণের দাম ২। উপকরণের বন্টন অর্থাৎ সমাজের মোট উৎপাদনে কোন শ্রেণীর উপকরণের শেয়ার বা অংশ কত। যেমন - শ্রমিকশ্রেণীর আয় কত হবে তা নির্ভর করছে শ্রমশক্তির দাম (মজুরী) এবং মোট উৎপাদনে শ্রমশক্তির অংশ (share) কত তার উপর। এভাবে পুঁজির দাম (সুদ) এবং মোট উৎপাদনে পুঁজির অংশ বা শেয়ার কত তার উপর নির্ভর করছে পুঁজিপতি শ্রেণীর আয় কত হবে। কাজেই একটি সমাজে মানুষের আয়ের বন্টন কিরূপ তা বুঝার জন্য প্রথমত: উপকরণসমূহের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তা জানা প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত: মোট উৎপাদনে উপকরণসমূহের অংশ বা share কিরূপ তা জানা প্রয়োজন। এখন চলুন প্রথমে দেখা যাক্ কিভাবে একটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের দাম নির্ধারিত হয়।

উপকরণের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপকরণের দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন- বাজার অর্থনীতিতে উপকরণের চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার (Interaction) মাধ্যমে বাজারে নৈর্ব্যক্তিকভাবে (Impersonally) উপকরণের দাম নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উপকরণের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় বাজারক্রিয়ার (Automatic market mechanism) ভূমিকা খুবই কম থাকে। আমরা শুধুমাত্র বাজার অর্থনীতিতে উপকরণের দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

আপনি উপরের আলোচনা থেকে জেনেছেন যে, বাজার অর্থনীতিতে উপকরণের চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে উপকরণের দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু উপকরণগুলোর যোগানের প্রকৃতি ভিন্ন। যেমন- শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমশক্তির যোগান স্বাভাবিকভাবে

বাড়বে, তেমনি সুদের হার বাড়লে ঋণদাতারা বেশী পরিমাণে ঋণ দিতে আগ্রহী হবে। তবে খাজনা যতই বাড়ানো হউক না কেন একটি দেশের বা সমাজের ভূমির পরিমাণ বাড়ানো কঠিন ব্যাপার। অন্যদিকে প্রত্যেকটি উপকরণের চাহিদার প্রকৃতি অনেকটা একই রকম। সকল উপকরণের চাহিদাকেই একটি নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। নীতিটি হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি (The principle of Marginal productivity)। যদিও সকল উপকরণের চাহিদার প্রকৃতি অনেকটা একই রকম তথাপিও যোগানের প্রকৃতি ভিন্ন বলে আমরা উপকরণবাজারগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করব এবং দেখব কিভাবে বিভিন্ন উপকরণের দাম নির্ধারিত হয়। তবে এ পাঠে আমরা শুধুমাত্র সুদ, মজুরী ও মুনাফা নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব। পরবর্তী পাঠে আমরা শ্রমবাজারে কিভাবে শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরী নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করব।
এবার চলুন প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নিই।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি

আপনি ইউনিট- ৩ এর পাঠ - ১ থেকে উপকরণের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন (Marginal physical product, MPP) ও প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন (Marginal revenue product, MRP) সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন। এসব ধারণাগুলোকে ব্যবহার করে আমরা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতিটিকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করতে পারি:

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি: প্রতিযোগিতামূলক উপকরণ বাজারে একটি মুনাফা সর্বাধিকরণেচ্ছুক র্ফাম বা প্রতিষ্ঠান একটি উপকরণের সেই পরিমাণই ভাড়া বা ক্রয় করবে যেখানে উপকরণটির প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন তার দামের সমান হয়।

এই নীতি অনুসারে, যদি কোন একটি উপকরণের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন তার দামের চেয়ে বেশী হয় তাহলে ফার্ম উপকরণটির নিয়োগ বাড়াতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত উপকরণটির প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন হ্রাস পেয়ে উপকরণটির দামের সমান না হয়। অন্যদিকে যদি উপকরণের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন তার দামের চেয়ে কম হয় তাহলে ফার্ম উপকরণ নিয়োগ কমাবে তাতে উপকরণটির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন তথা প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে উপকরণটির দামের সমান হবে। নিচের কাল্পনিক ছকটির দিকে লক্ষ্য করলে আপনি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি অনুসারে কিভাবে একটি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান উপকরণ নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবেন।

সারের পরিমাণ (কেজি)	প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন (কেজি)	প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন (টাকা)
১	৫	১৫
২	৬	১৮
৩	৮	২৪
৪	৬	১৮
৫	৫	১৫
৬	৪	১২
৭	১	৩
৮	০	০
৯	-১	-৩

ছক-৭.১: আলু চাষে টি.এস.পি সারের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন ও প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন।

ছক-৭.১ এর প্রথম কলামে সারের পরিমাণ, দ্বিতীয় কলামে সারের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন ও তৃতীয় কলামে সারের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন। ধরা যাক্ সারের কেজি প্রতি দাম ৬ টাকা। ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ৬ কেজি সার ব্যবহার করবে। কেননা ৭ম কেজি সারের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন ৩ টাকা যা ৭ম কেজি সারের দামের চেয়ে কম। এতে কৃষকের ক্ষতি হবে। তাই

কৃষক ৬ষ্ঠ কেজি পর্যন্ত সার ব্যবহার করবে। আবার কৃষক সারের ব্যবহার ৪র্থ কেজি পর্যন্ত সীমিত রাখবে না। কেননা ৪র্থ কেজি সারের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন তার দামের চেয়ে বেশী যা কৃষকের মুনাফা নির্দেশ করছে। ফলে মোট মুনাফা বৃদ্ধির আশায় কৃষক জমিতে সারের ব্যবহার বাড়াবে। এভাবে ৬ষ্ঠ কেজি সার ব্যবহারের পর কৃষক আর সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে না কেননা ৭ম কেজি সারের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন তার দামের চেয়ে কম।

এখন ধরা যাক্ সারের দাম বেড়ে কেজিপ্রতি ১৩ টাকা হয়েছে। এ অবস্থায় ছক ৭.১ থেকে দেখছি কৃষক ৫ম কেজি পর্যন্ত সার ব্যবহার করবে কেননা ৬ষ্ট কেজি সারের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন এখন সারের কেজিপ্রতি দামের চেয়ে কম। আবার যদি সারের দাম হ্রাস পেয়ে কেজি প্রতি ৩ টাকা হয় তাহলে কৃষক সারের ব্যবহার বাড়াবে। তবে ৭ম কেজির পরে সারের ব্যবহার বাড়াবে না। কেননা ৮ম কেজি সারের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন শূন্য (০)।

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি আপনি একটি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান উপকরণ ব্যবহার বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি অনুসরণ করে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন। তাছাড়া আপনি দেখলেন উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে ফার্ম উপকরণের ব্যবহার হ্রাস করে এবং উপকরণের দাম হ্রাস পেলে ফার্ম উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ উপকরণের দাম ও উপকরণের ব্যবহারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি আমাদেরকে একটি উপকরণের চাহিদা সম্পর্কেও ধারণা দিচ্ছে।
এখন চলুন পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যাক্ কিভাবে সুদের হার, খাজনা ও মুনাফা নির্ধারিত হয়।

সুদের হার নির্ধারণ

পুঁজি ব্যবহারের জন্য পুঁজির মালিককে যে অর্থ প্রদান করতে হয় তা-ই পুঁজির দাম বা সুদ। পুঁজি বাজারে পুঁজির চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে সুদের হার নির্ধারিত হয়। তাই সুদের হার নির্ধারণ প্রক্রিয়া বুঝার জন্য প্রথমে পুঁজির চাহিদা ও যোগান বলতে কি বুঝায় তা জেনে নেয়া প্রয়োজন।

পুঁজি ব্যবহারের জন্য পুঁজির মালিককে যে অর্থ প্রদান করতে হয় তা-ই পুঁজির দাম বা সুদ।

পুঁজির চাহিদা মূলতঃ নির্ভর করে সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদনের উপর। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে উৎপাদক ব্যাংক বা অন্য কোন উৎস হতে কম পরিমাণে অর্থ ধার করতে চাইবে কারণ সুদের হারটা উৎপাদকের খরচের খাতায় লিখা হয় বিধায় বিনিয়োগ থেকে সে আগের চাইতে এখন কম পরিমাণে মুনাফা পাবে। আবার সুদের হার হ্রাস পেলে বিনিয়োগ লাভজনক বিধায় উৎপাদক বেশী পরিমাণে অর্থ ধার করতে চাইবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, পুঁজির চাহিদার পরিমাণ ও সুদের হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। চিত্র ৭.১ এ পুঁজির চাহিদা রেখা দেখানো হলো।

চিত্র ৭.১: পুঁজির চাহিদা রেখা

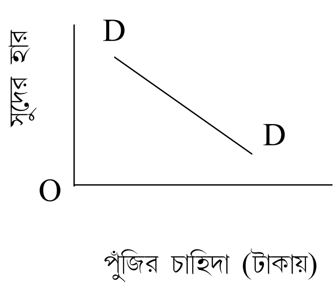

চিত্র ৭.১: এ দেখা যাচ্ছে পুঁজির চাহিদারেখা ডানদিকে নিম্নগামী অর্থাৎ সুদের হার বাড়লে পুঁজির চাহিদা কমে অর্থাৎ উৎপাদক কম অর্থ ধার করে এবং সুদের হার কমলে পুঁজির চাহিদা বাড়ে অর্থাৎ উৎপাদক বেশী অর্থ ধার করে।

পুঁজির যোগানও নির্ভর করে সুদের হারের উপর। যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায় তাহলে ঋণ দাতারা বেশী করে ঋণ দিতে চাইবে অর্থাৎ পুঁজির যোগান বাড়বে। আবার সুদের হার হ্রাস পাইলে ঋণদাতারা ঋণের পরিমাণ হ্রাস করবে অর্থাৎ পুঁজির যোগান হ্রাস পাবে। চিত্র ৭.২ -এ পুঁজির যোগানরেখা দেখানো হলো।

চিত্র ৭.২: পুঁজির যোগানরেখা

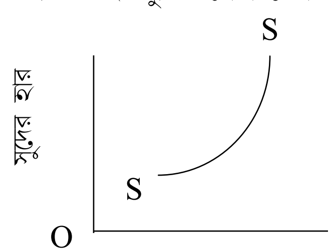

চিত্র ৭.২: পুঁজির যোগানরেখা।

চিত্র ৭.২ এ দেখা যাচ্ছে, পুঁজির যোগানরেখা ডানদিকে উর্ধগামী অর্থাৎ সুদের হার বাড়লে পুঁজির যোগান বাড়ে এবং সুদের হার কমলে পুঁজির যোগান হ্রাস পায়।

এবার পুঁজির যোগান ও পুঁজির চাহিদারেখাকে একই চিত্রে এনে পুঁজি বাজারের ভারসাম্য ও সুদের হার নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপে দেখা যাক্ -

চিত্র ৭.৩: পুঁজিবাজারের ভারসাম্য

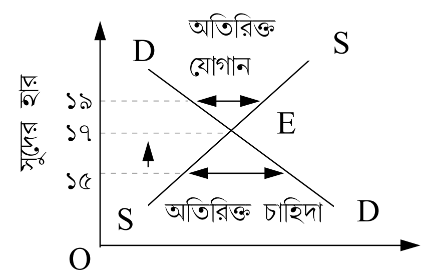

চিত্র ৭.৩: পুঁজিবাজারের ভারসাম্য।

চিত্র ৭.৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, E বিন্দুতে পুঁজি বাজারে ভারসাম্য দেখা দিয়েছে অর্থাৎ E বিন্দুতে পুঁজির চাহিদা ও পুঁজির যোগান সমান। ভারসাম্য সুদের হার হচ্ছে ১৭%। চিত্র থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, সুদের হার হ্রাস পেয়ে ১৫% হলে পুঁজি বাজারে পুঁজির অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দেয় ফলে সুদের হার বাড়বে, তাতে পুঁজির যোগান বাড়বে ও চাহিদা কমবে। এভাবে একপর্যায়ে সুদের হার পুনরায় ১৭% এ নির্ধারিত হবে। আবার সুদের হার বেড়ে ১৯% হলে পুঁজিবাজারে পুঁজির অতিরিক্ত যোগান দেখা দিবে অর্থাৎ ঋণদাতারা ১৯% সুদের হারে যে পরিমাণ টাকা ধার দিতে ইচ্ছুক, উৎপাদকরা ঐ সুদের হারে তার চেয়ে কম পরিমাণ টাকা ধার নিতে চায়। এর ফলে সুদের হার কমার প্রবণতা দেখা দিবে। এক পর্যায়ে সুদের হার পুনরায় ১৭% এ স্থির হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আপনি দেখলেন, কিভাবে পুঁজিবাজারে পুঁজির চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে পুঁজির দাম অর্থাৎ সুদের হার নির্ধারিত হয়। এবার আমরা দেখব কিভাবে ভূমি বাজারে খাজনার হার নির্ধারিত হয়।

খাজনার হার নির্ধারণ

ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে অর্থ প্রদান করতে হয় তা-ই খাজনা। পুঁজিবাজারে যেমন পুঁজির যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে সুদের হার নির্ধারিত হয় ঠিক তেমনিভাবে ভূমি বাজারে ভূমির চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে ভূমি ব্যবহারের খরচ বা খাজনা নির্ধারিত হয়। চিত্র ৭.৪ এ ভূমি বাজারে খাজনা নির্ধারণ প্রক্রিয়া দেখানো হলো

ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে অর্থ প্রদান করতে হয় তা-ই খাজনা।

চিত্র ৭.৪: ভূমি বাজারে ভারসাম্য

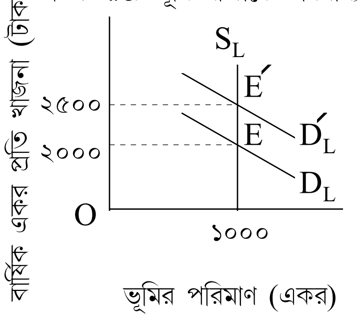

চিত্র ৭.৪ এ দেখা যাচ্ছে S_L হচ্ছে ভূমির যোগানরেখা যাহা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল অর্থাৎ ভূমির যোগান স্থির। খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে ভূমির যোগানের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। ইচ্ছা করলে হয়ত জমির গুনগত মানের পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু ভূমির চাহিদারেখা D_L ডানদিকে নিম্নগামী অর্থাৎ খাজনার হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ভূমির চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। E বিন্দুতে ভূমির চাহিদারেখা ও যোগানরেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে ফলে E বিন্দু হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু। ২০০০ টাকা হচ্ছে ভারসাম্য খাজনা। চিত্র ৭.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেহেতু ভূমির যোগান স্থির সেহেতু ভূমির খাজনা নির্ধারণে ভূমির যোগানের কোন ভূমিকা নাই। ভূমির চাহিদারেখাই মূলত: খাজনা নির্ধারণ করে থাকে। যদি কোন কারণে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে D_L রেখাটি উপরের দিকে স্থানান্তরিত হবে। ফলে খাজনার নতুন হার নির্ধারিত হবে। চিত্র ৭.৪ এ ভূমির চাহিদারেখা স্থানান্তরিত হয়ে D_L' হওয়াতে E' বিন্দুতে নতুন করে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং নতুন ভারসাম্য খাজনা হচ্ছে ২৫০০ টাকা।

কী কী কারণে ভূমির খাজনা বৃদ্ধি পায়?

মূলত: দুটো কারণে ভূমির খাজনা বৃদ্ধি পেতে পারে

- যদি একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে ফলে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভূমির যোগানের পরিমাণ স্থির বিধায় ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র ভূমির খাজনা বাড়বে।

- যদি ভূমি ব্যবহারের নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় তাহলে ভূমির প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদকের খাজনা দেয়ার সামর্থ বৃদ্ধি পায়। তাই ভূমির মালিক বেশী খাজনা দাবী করবে।

উপরের আলোচনা থেকে আপনি ভূমির খাজনা নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেলেন। কিন্তু আপনার মনে হয়ত একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সকল জমির খাজনা কি একই হওয়া উচিত? চলুন এবিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

আলোচনা

আমরা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, জমির বিভিন্ন প্লট বা খন্ড কখনোই একই হতে পারে না। মাটির গুণাগুন বা অবস্থানগত কারণে একটি দেশের বা সমাজের বিভিন্ন খন্ড জমির মধ্যে ভিন্নতা থাকাটা স্বাভাবিক। যেমন - চট্টগ্রামের সমতল এলাকার জমি ও পাহাড়ী এলাকার জমি একইরকম হওয়ার কথা নয়, আবার চট্টগ্রামের সমতল এলাকার মধ্যে শহরের বাহিরের একখন্ড জমি ও শহরের ভিতরের একখন্ড জমির মধ্যেও বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কাজেই যেহেতু মাটির গুণাগুন বা অবস্থানগত কারণে জমির বিভিন্ন খন্ডের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে সেহেতু তাদের খাজনাও ভিন্ন হওয়া উচিত। কিভাবে আপনি বুঝবেন কোন্ জমির খাজনা কী হওয়া উচিত? এটা বুঝার জন্য আমরা একটি উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি। ধরুণ, A ও B হচ্ছে দুই খন্ড জমি। জমি- A তে কোন একটি ধান চাষের জন্য খাজনাবাদে খরচ হয় ১০০০ টাকা। অন্যদিকে জমি- B তে একই ধান চাষের জন্য খাজনাবাদে খরচ হয় ৮০০ টাকা। এমতাবস্থায় কোন জমিটির খাজনা বেশী হওয়া উচিত? নিশ্চয়ই আপনি বলবেন জমি- B এর খাজনা বেশী হওয়া উচিত। কত টাকা বেশী হওয়া উচিত? অবশ্যই জমি- A এর খাজনা থেকে ২০০ টাকা বেশী হওয়া উচিত। কেন? কারণ যদি জমি- A এর খাজনা ও জমি- B এর খাজনার পার্থক্য ২০০ টাকার কম হয়, ধরা যাক ১৫০ টাকা হয়, তাহলে জমি- B তে ধান চাষ করলে জমি- A এর চাইতে ৫০ টাকা কম খরচ হবে। অর্থাৎ জমি- B তে ধান চাষ করাটা বেশী মুনাফাজনক। কাজেই চাষীরা সবাই জমি- B কে ধানচাষের জন্য ভাড়া করতে চাইবে অর্থৎ জমি- B এর চাহিদা বাড়বে। ফলে জমি- B এর খাজনা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে জমি- A এর চাহিদা হ্রাস পাওয়াতে তার খাজনা হ্রাস পাবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত জমিদুটোর খাজনার পার্থক্য ২০০ টাকা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে

থাকবে। কাজেই উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, ভাল মানের জমি ও নিম্ন মানের জমিতে একটি দ্রব্য উৎপাদনের খরচের যে পার্থক্য তা জমি দুটোর খাজনার পার্থক্যের সমান।

আলোচনার আরও গভীরে প্রবেশ করলে আমরা একখন্ড জমির খাজনা কত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে সক্ষম হব। চলুন সেদিকে অগ্রসর হওয়া যাক্‌ প্রতিটি সমাজে বা দেশে এমন কিছু জমি থাকে যেগুলো খুব নিম্ন মানের, কেউ সেগুলো ব্যবহার করে না। ঐসব জমিকে বলা হয় প্রান্তিক জমি (Marginal land)। উদাহরণস্বরূপ, আপনি মরু এলাকার কথা চিন্তা করতে পারেন। প্রান্তিক জমির জন্য কোন খাজনা পাওয়া যায় না, কারণ এসব জমি কেহই ভাড়া নেয় না। এখন পূর্বের উদাহরণে, জমি - A কে প্রান্তিক জমি ধরলে আমরা জমি - B এর খাজনা সুনির্দিষ্টভাবে বের করতে পারি।

প্রতিটি সমাজে বা দেশে এমন কিছু জমি থাকে যেগুলো খুব নিম্ন মানের, কেউ সেগুলো ব্যবহার করে না। ঐসব জমিকে বলা হয় প্রান্তিক জমি।

নিচে জমি- B এর খাজনা বের করার প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো:

জমি- A তে ধান উৎপাদনের মোট খরচ=জমি- A এর খাজনা + খাজনাবাদে অন্যান্য খরচ

= ০ + ১০০০ টাকা (যেহেতু জমি- A প্রান্তিক জমি, তাই তার খাজনা শূন্য)

= ১০০০ টাকা।

জমি- B তে ধান উৎপাদনের মোট খরচ = জমি- B এর খাজনা + খাজনাবাদে অন্যান্য খরচ

= জমি- B এর খাজনা + ৮০০ টাকা।

যেহেতু আমরা পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ভূমিবাজারে খাজনা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করছি সেহেতু জমি- A ও জমি- B তে ধান উৎপাদনের মোট খরচ (খাজনাসহ) অবশ্যই সমান হবে যদি কোন কারণে ভিন্নও হয় তাহবে সাময়িক। কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে তা দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। কাজেই আমরা লিখতে পারি:

জমি- A তে ধান উৎপাদনের মোট খরচ = জমি- B তে ধান উৎপাদনের মোট খরচ

বা, ১০০০ টাকা = জমি- B এর খাজনা + ৮০০ টাকা

$\therefore$ জমি- B এর খাজনা = ১০০০ টাকা - ৮০০ টাকা = ২০০ টাকা

সুতরাং আমরা খাজনাকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি:

একখন্ড জমির খাজনা হচ্ছে ঐ জমিতে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের খরচ ও প্রান্তিক জমিতে ঐ একই দ্রব্য উৎপাদনের খরচের পার্থক্যের সমান।

মুনাফা নির্ধারণ

আপনি পূর্বের ইউনিটগুলোতে মুনাফা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। তাই এ পাঠে মুনাফা সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না।

মূলত: মুনাফা হচ্ছে একধরনের অবশিষ্টাংশ (Residual) অর্থাৎ একজন উৎপাদক তার উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে যে আয় পায় তা থেকে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের জন্য খরচ বাদ

দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মুনাফা। অন্যান্য উপকরণ বলতে পুঁজি, শ্রম ও ভূমি- কে বুঝানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন থাকে যে, মুনাফা উৎপাদনের কোন্ উপকরণটির দাম অর্থাৎ উৎপাদনের কোন উপকরণটি মুনাফা পায়? উৎপাদনের যে উপকরণটি মুনাফা পায় সেই উপকরণটির নাম হচ্ছে উদ্যোগ (Entrepreneurship)। উৎপাদক নিজেই হচ্ছেন উদ্যোক্তা (Entrepreneur)। উৎপাদনের সম্পূর্ণ ঝুঁকিটা তাকেই বহন করতে হয়। তাই সে-ই মুনাফা পেয়ে থাকে। উদ্যোক্তা যে মুনাফা পায় তার পুরোটাই কি উৎপাদন খরচের অংশ? না। শুধুমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হচ্ছে উৎপাদন খরচের অংশ। আপনি নিশ্চয়ই ইউনিট- ৪ এ স্বাভাবিক মুনাফা ও অস্বাভাবিক মুনাফা এই ধারণা দুটোর সাথে পরিচিত হয়েছেন। তাই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা যায়, উদ্যোক্তা উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করার মূল্য হিসেবে স্বাভাবিকভাবে (naturally) যে অর্থ পাওয়া উচিত তাহাই স্বাভাবিক মুনাফা। এটাকে উৎপাদনের খরচের মধ্যে ধরা হয়। অন্যদিকে উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বা অন্যকোন একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যদি উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশী দামে দ্রব্য বিক্রি করতে পারে, তাহলে উৎপাদন খরচের অতিরিক্ত অর্থটা হচ্ছে অস্বাভাবিক মুনাফা। তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও একজন উৎপাদক স্বল্পমেয়াদে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। কিন্তু বেশীদিন এ অবস্থা বজায় রাখা যায়না।।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি তা হলো, স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত আর অস্বাভাবিক মুনাফার আবির্ভাব ঘটে বাজারে উৎপাদকের বিশেষ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ ও অন্যকোন সুবিধার ফলে।

আমরা এতক্ষণ উৎপাদনের তিনটি উপকরণের দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখন চলুন মোট উৎপাদনে উৎপাদনের উপকরণসমূহের শেয়ার বা অংশ সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নিই।

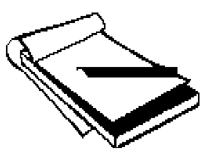

অনুশীলন
বাংলাদেশের দুইটি অঞ্চলের নাম লিখুন যেখানকার জমি হচ্ছে প্রান্তিক জমি। ধরুন, কুমিল্লা শহর ও ঢাকা শহরের জমির যোগান সমান, এমতাবস্থায় কুমিল্লা শহরের জমি থেকে ঢাকা শহরের জমির খাজনা বেশী হওয়ার কারণ চিত্রের সাহায্যে দেখান।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

আয়	অস্বাভাবিক মুনাফা
সুদের হার	প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি
খাজনা	আয়ের বন্টন
স্বাভাবিক মুনাফা	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতিটি কি? এটা কিভাবে উপকরণের চাহিদার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়?

২. কিভাবে ভূমিবাজারে খাজনা নির্ধারিত হয়? কিভাবে আপনি একখন্ড জমির খাজনা সুনির্দিষ্ট ভাবে বের করবেন?

৩. ভূস্বামী কোন্ উপকরণটির মালিক
   ক) পুঁজি
   খ) ভূমি
   গ) শ্রমশক্তি
   ঘ) কোনটিই নয়

৪. কিভাবে পুঁজিবাজার ভারসাম্যে পৌঁছে? প্রকৃত সুদের হার ভারসাম্য সুদের হার থেকে কম হলে পুঁজি বাজারে কী সমস্যা দেখা দেয়? সমস্যাটি কি স্থায়ী?

৫. কিভাবে স্বাভাবিক মুনাফা ও অস্বাভাবিক মুনাফা বলতে কী বুঝেন? কোনটি উৎপাদন খরচের অংশ? উৎপাদিত দ্রব্যের দাম যদি উৎপাদন খরচের সমান হয়ে যায় তখন কি উৎপাদক মুনাফা পাবে?

৬. প্রান্তিক জমির খাজনা
   ক. অসীম
   খ. শূন্য
   গ. ক ও খ এর কোনটিই নয়
   ঘ ক ও খ উভয়ই হতে পারে।

৭. নিচের কোন্টি উৎপাদন খরচের অংশ নয়
   ক. স্বাভাবিক মুনাফা
   খ. অস্বাভাবিক মুনাফা
   গ. সুদ
   ঘ. খাজনা

পাঠ-২: শ্রমবাজার ও মজুরী নির্ধারণ প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শ্রমশক্তির যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- শ্রমবাজারের ভারসাম্য বর্ণনা করতে পারবেন
- শ্রমশক্তির দাম বা মজুরী নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

গত পাঠে আপনি উৎপাদনের তিনটি উপকরণ যথা - পুঁজি, ভূমি ও উদ্যোগ বা Entrepreneurship এর দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তা জেনেছেন। এই তিনটি ছাড়াও উৎপাদনের আরেকটি অন্যতম উপকরণ হচ্ছে শ্রমশক্তি। এই পাঠে আপনি শ্রমবাজারে কিভাবে শ্রমশক্তির দাম বা মজুরী নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শ্রমশক্তি কী?

শ্রমশক্তি উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। এটা ছাড়া উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে পারে না। যেমন আপনি যদি কৃষক হন তাহলে জমিতে ধান চাষের সময় আপনাকে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়, যদি ময়দার মিলের মালিক হন তাহলেও আপনাকে ময়দা তৈরীর জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। এভাবে যে কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। হয়ত আপনি বলতে চাইবেন যে, উৎপাদনে আপনি স্বয়ংক্রিয় মেশিন ব্যবহার করবেন ফলে শ্রমিক নিয়োগের আদৌ প্রয়োজন পড়বে না। আপনার এ যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ স্বয়ংক্রিয় মেশিন তো দেবতারা এসে চালু করেন না। চালু করার জন্যও তো একজন লোকের প্রয়োজন হয়। কাজেই এ ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, শ্রমশক্তি ছাড়া কোনকিছুই উৎপাদন করা যায় না। একক্ষেত্রে হয়ত শ্রমশক্তি বেশী লাগে আর অন্যক্ষেত্রে হয়ত কম পরিমাণ শ্রমশক্তি প্রয়োজন হয়। কিন্তু উৎপাদন করতে হলে শ্রমশক্তি লাগবেই।

উপরের আলোচনায় আপনি **'শ্রমিক'** ও **'শ্রমশক্তি'** ধারণাদুটোর পুনরাবৃত্তি হতে দেখেছেন। এতে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কোনকিছু উৎপাদন করতে **'শ্রমিক'** প্রয়োজন নাকি **শ্রমশক্তি** প্রয়োজন? মূলতঃ উৎপাদন করতে শ্রমশক্তির প্রয়োজন। আর শ্রমিক হচ্ছে শ্রমশক্তির মালিক। যেমন - একজন কাঠমিস্ত্রীকে যদি বলা হয় একটি চেয়ার তৈরি করতে, তাহলে সে সারাদিন পরিশ্রম করে চেয়ারটি তৈরি করবে। এক্ষেত্রে কাঠমিস্ত্রীর দেহের কোন অংশ (হাত, পা বা অন্যকিছু) কিন্তু চেয়ার তৈরিতে কাজে লাগানো হবে না। শুধুমাত্র তার শ্রমশক্তিটাকে কাজে লাগানো হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, কোন কিছু উৎপাদনে শ্রমিক নামক মানুষটার শক্তিটাকে শুধু কাজে লাগানো হয়ে থাকে। শ্রমিকের এই শক্তি যাকে উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তাকে বলা হয় শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তির ভিতরে শ্রমিকের শারিরীক পরিশ্রম ও মেধা উভয়ই অর্ন্তভুক্ত। তাই মেধার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের শ্রমশক্তি ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, একজন কাঠমিস্ত্রী ও একজন রডমিস্ত্রী দুজনই সারাদিন পরিশ্রম করছে কিন্তু তারা তৈরি করছে ভিন্ন দ্রব্য। এক্ষেত্রে উভয়ের শারীরিক পরিশ্রম একই, কিন্তু দুজনের মেধা ভিন্ন, কেননা কাঠমিস্ত্রী যে চেয়ার উৎপাদন করছে রড়মিস্ত্রী তা পারছে না, অন্যদিকে রড়মিস্ত্রী যে দা, কাঁচি তৈরি করছে তা আবার কাঠমিস্ত্রী তৈরি করতে পারছে না।

> শ্রমিকের শক্তি যাকে উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তাকে বলা হয় শ্রমশক্তি।

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি আপনি শ্রমশক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন। একজন উৎপাদক একজন শ্রমিক থেকে শ্রমশক্তি ক্রয় করে থাকে। বিনিময়ে শ্রমিককে শ্রমশক্তির দাম হিসেবে মজুরী দেয়। এখন চলুন দেখা যাক্ শ্রমবাজারে কিভাবে শ্রমশক্তির দাম বা মজুরী নির্ধারিত হয়।

শ্রম বাজার

আপনি ইউনিট - ৪ ও ৫ থেকে বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন। বিভিন্ন পণ্যের বাজারের বিভিন্ন নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, যে বাজারে পুঁজি নামক পণ্যের বেচাকেনা হয় সেটাকে বলা হয় পুঁজিবাজার, যে বাজারে আম বেচাকেনা হয় তাকে বলে আমের বাজার। ঠিক তেমনি যে বাজারে শ্রমশক্তি বেচাকেনা হয় তাকে বলা হয় শ্রমবাজার। অন্য ভাষায় বলা যায়, শ্রমবাজার হচ্ছে শ্রমশক্তির সম্ভাব্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সমষ্টি। শ্রমশক্তির ক্রেতা হচ্ছে উৎপাদক আর শ্রমশক্তির বিক্রেতা হচ্ছে শ্রমিক।

শ্রমবাজার হচ্ছে শ্রমশক্তির সম্ভাব্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সমষ্টি।

প্রতিযোগিতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে শ্রমবাজার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন - ***প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার*** যেখানে শ্রমশক্তির অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে দরকষাকষির ফলে একপর্যায়ে শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরী নির্ধারিত হয়, ***মনোপসনি শ্রমবাজার*** যেখানে শ্রমশক্তির একজনমাত্র ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে, ***একচেটিয়া শ্রমবাজার*** যেখানে একপক্ষে শ্রমশক্তির অসংখ্য ক্রেতা থাকে অন্যপক্ষে শ্রমশক্তির বিক্রেতারা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে একচেটিয়া কারবারীর মত আচরণ করে। শিল্প শ্রমিক সংঘ (Industrial Labor Union), কারিকর সংঘ (Craft Union) প্রভৃতি হচ্ছে শ্রমিক সংঘের উদাহরণ।

বিভিন্ন শ্রমবাজারে শ্রমশক্তির দাম বা মজুরী নির্ধারণের প্রক্রিয়াও ভিন্ন। বর্তমান পাঠে আমরা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে কিভাবে শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরী নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে শ্রমশক্তির অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির ফলে মজুরী নির্ধারিত হয়। মূলতঃ একটি অর্থনীতিতে দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনকারীরাই হচ্ছে শ্রমশক্তির ক্রেতা বা চাহিদা সৃষ্টিকারী, অন্যদিকে শ্রমিকরা হচ্ছে শ্রমশক্তির যোগানদার। নিচের আলোচনা থেকে আপনি শ্রমশক্তির যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

অনুশীলন

বাংলাদেশের ৩টি শ্রমিক সংঘের নাম লিখুন। শ্রমিক সংঘগুলো কিভাবে তাদের একতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দিন।

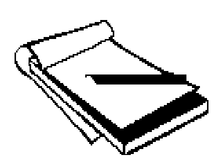

শ্রমশক্তির যোগান

উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যেমন ভূমি, পুঁজি প্রভৃতিকে যেভাবে পরিমাপ করা হয় শ্রমশক্তিকে ঠিক তেমনভাবে পরিমাপ করা যায় না। কেননা শ্রমশক্তি হচ্ছে একটি গুণবাচক (abstract) বিষয় যাহা ধরা ছুয়াঁর বাইরে। তাই শ্রমশক্তিকে মাপার জন্য একটি প্রক্সি (proxy) ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে শ্রমঘন্টা অর্থাৎ শ্রমিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যতঘন্টা সংশ্লিষ্ট থাকছে সেই সময়টাকেই শ্রমিকের শ্রমশক্তি হিসেবে ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন গার্মেন্টিস শ্রমিক যদি গতকাল গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীতে ৮ ঘন্টা কাজ করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঐ শ্রমিকটি গতকাল ৮ শ্রমঘন্টা শ্রমশক্তি বিক্রি করেছে। তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, শ্রমশক্তিকে কোন কিছু উৎপাদনে শ্রমিক যতক্ষণ কাজ করে সে সময়ের মাধ্যমে হিসেব করা হয়। এবার হয়ত আপনার মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, একজন শ্রমিক দৈনিক কত শ্রমঘন্টা শ্রমশক্তি বিক্রি বা সরবরাহ করতে চাইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া বেশ কঠিন কাজ। কেননা একজন শ্রমিক যদি তার শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে, তাহলে সে নিজে ছাড়া অন্য কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় সে কতটুকু শ্রমশক্তি বিক্রি করবে। অবশ্য যদি শ্রমশক্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা না থাকে অর্থাৎ সে যদি চুক্তিবদ্ধ থাকে যে, সে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করে কাজ করবে তাহলে হয়ত ঐ শ্রমিক কত শ্রমঘন্টা শ্রমশক্তি দৈনিক সরবরাহ করবে তা অগ্রিম বলা সম্ভব। কিন্তু আমরা যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনা করছি সেহেতু শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা শ্রমিকের শ্রমশক্তি সরবরাহের ব্যাপারে খুব বেশী কিছু বলতে পারছি না। তারপরেও আমরা আমাদের সাধারণ বোধশক্তি (common sense) ও কিছু বাস্তব তথ্যের আলোকে শ্রমশক্তি সরবরাহের বিষয়ে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দাড় করবার চেষ্টা করছি।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, একজন শ্রমিক ইচ্ছে করলে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টাই ফ্যাক্টরী বা অন্য কোন উৎপাদনক্ষেত্রে কাজ করতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য তার আহার ও নিদ্রার প্রয়োজন আছে। ধরুন, খাওয়াদাওয়া ও ঘুমানোর সময় বাদে প্রতিদিন তার হাতে সময় থাকে ১২ ঘন্টা। এখন সে ইচ্ছে করলে ১২ ঘন্টাই কাজ করতে পারে অথবা শুধুমাত্র ৮ ঘন্টা কাজ করতে পারে। যদি সে শুধু ৮ ঘন্টা কাজ করে তাহলে প্রশ্ন থাকছে, বাকী ৪ ঘন্টা সময়ে সে কী করবে? নিশ্চয়ই

ঐ সময়টাতে সে বিশ্রাম নিবে। এখন বিশ্রামকে যদি আমরা একটি পণ্য হিসেবে (পাউরুটি, সেন্ডুইচ প্রভৃতির মত) বিবেচনা করি তাহলে বিশ্রামের দাম কত হবে তাও হিসেব করতে হবে। এ কাজটা খুব বেশী কঠিন নয়। কারণ উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, শ্রমিক ব্যক্তিটি ১২ ঘন্টার মধ্যে ৮ ঘন্টা কাজ করেছে ও ৪ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়েছে, যদিও সে ইচ্ছে করলে ১২ ঘন্টাই কাজ করতে পারতো এতে তার মোট আয় বা মজুরী বেশী হতো। কিন্তু সে ৪ ঘন্টা কাজ না করে বিশ্রাম নেয়াতে ৪ ঘন্টার মজুরী কম পাচ্ছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে ৪ ঘন্টা কাজ করে যে টাকা পাওয়া যেত তা-ই ৪ ঘন্টা বিশ্রামের দাম। অর্থাৎ সে ৪ ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার জন্য ৪ ঘন্টার মজুরী ত্যাগ করেছে। এখন ঘন্টা প্রতি মজুরী যদি আগের চাইতে বেশী হয় তাহলে শ্রমিককে ৪ ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার জন্য আগের চাইতে বেশী অর্থ বিসর্জন (sacrifice) দিতে হচ্ছে অর্থাৎ বিশ্রামটা আগের চাইতে ব্যয়বহুল (costly) হয়ে গেছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, মজুরীর হার (ঘন্টাপ্রতি মজুরী) যদি বেশী হয় তাহলে বিশ্রাম ব্যয়বহুল ও মজুরীর হার যদি কম হয় তাহলে বিশ্রাম সস্তা হয়ে যায়। উপরের আলোচনা থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছঁতে পারলাম যে, একজন শ্রমিক যে পণ্য বিক্রয় বা যোগান দিয়ে আয় পায় সেটি হচ্ছে শ্রমশক্তি এবং সে যেসব পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে (ভোগের জন্য) সেগুলোর মধ্যে বিশ্রাম হচ্ছে একটি। বিশ্রাম পাওয়ার জন্য শ্রমিককে কাজ কম করতে হয় অর্থাৎ কিঁছু মজুরী থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ফলে মজুরী যত বাড়ে বিশ্রাম ততই ব্যয়বহুল হয়ে যায়। এখন দেখা যাক্ মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের সিদ্ধান্তে কি প্রভাব পড়ে। মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের চিন্তাচেতনায় নিম্নোক্ত দুধরনের প্রভাব পড়বে:

১) আয়প্রভাব - মূলত: মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তার নিকট ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়বে। আর বিশ্রাম যেহেতু একটি ভোগ্য পণ্য, তাই বিশ্রামের চাহিদাও বাড়বে। কিন্তু বিশ্রাম বাড়াতে হলে তাকে অবশ্যই কাজের পরিমাণ কমাতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রমিকের মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক যেহেতু এখন কম কাজ করে আগের চাইতে বেশী পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম, সেহেতু সে কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে বিশ্রামের পরিমাণ বাড়াতে চাইবে। এটা হচ্ছে মজুরী বৃদ্ধির আয় প্রভাব। অতএব, আয় প্রভাবের কারণে মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক কম কাজ করে অর্থাৎ শ্রমশক্তির যোগান হ্রাস পায়।

২) বিকল্প প্রভাব - যেহেতু শ্রমিক বিশ্রাম নেয়ার জন্য কাজ করার পরিমাণ কমাতে হয় অর্থাৎ শ্রমিককে মজুরীর অর্থ থেকে বঞ্চিত হতে হয় সেহেতু মজুরীর হারকে বিশ্রামের দাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাজেই মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে 'বিশ্রাম' অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের তুলনায় বেশী ব্যয়বহুল (Expensive) হয়ে পড়ে। তাই শ্রমিক বিশ্রামের চেয়ে অন্যান্য পণ্য কিনতে বেশী আগ্রহী হয়। কিন্তু অন্যান্য পণ্য ক্রয়ের জন্য তো টাকা লাগে। আর টাকা উপার্জনের জন্য শ্রমিককে কাজের পরিমাণ বাড়াতে হয়। এটাই হচ্ছে মজুরীর হার বৃদ্ধির বিকল্প প্রভাব। অতএব, বিকল্প প্রভাবের কারণে মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক বেশী পরিমাণে কাজ করতে আগ্রহী হয় অর্থাৎ বাজারে শ্রমশক্তির যোগান বৃদ্ধি পায়।

বিকল্প প্রভাবের কারণে মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক বেশী পরিমাণে কাজ করতে আগ্রহী হয়

উপরোক্ত দুটো প্রভাবকে একত্রে বিবেচনায় রাখলে দেখা যায় যে, মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজ বাড়িয়ে দেয়, কিছুসংখ্যক শ্রমিক কাজ কমিয়ে দেয়, আবার অনেকে কোনরূপ প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করে না। কাজেই আমরা যদি পুরো শ্রমবাজারের শ্রমিকদেরকে একত্রিত করে দেখি তাহলে মজুরী বৃদ্ধির ফলে শ্রমের মোট যোগান বাড়তে পারে অথবা কমতেও পারে। তবে বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানিক সমীক্ষা (Statistical Studies) থেকে নিম্নোক্ত উপসংহারে পৌছা যায় - (ক) নিম্ন মজুরীস্তরে বিকল্প প্রভাব আয় প্রভাব থেকে বেশী হয় ফলে শ্রমিকরা বেশী কাজ করে অর্থাৎ নিম্নমজুরীস্তরে মজুরী বাড়লে শ্রমশক্তির যোগান বাড়ে এবং (খ) উচুঁমজুরীস্তরে আয় প্রভাব বিকল্প প্রভাব থেকে বেশী হয় ফলে শ্রমিকরা কম কাজ করে অর্থাৎ উচু মজুরীস্তরে মজুরী বাড়লে শ্রমশক্তির যোগান হ্রাস পায়। নিচের চিত্রে বিষয়টি দেখানো হলো:

চিত্র ৭.৫: শ্রমশক্তির যোগানরেখা

চিত্র ৭.৫: একজন শ্রমিকের
শ্রমশক্তির যোগানরেখা

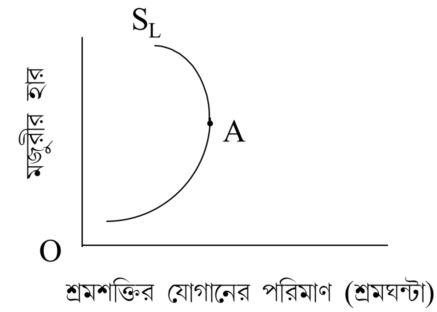

চিত্র ৭.৫ এ S_L হচ্ছে পিছনের দিকে বাঁকা শ্রমশক্তির যোগানরেখা। S_L রেখার A বিন্দুর নিচের অংশে মজুরী বাড়ার সাথে সাথে শ্রমশক্তির যোগান বাড়ছে কেননা এক্ষেত্রে বিকল্প প্রভাব আয়প্রভাব থেকে বেশী। আর A বিন্দুর উপরে দেখা যাচ্ছে মজুরী বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমশক্তির যোগান কমছে। কারণ, A বিন্দুর উপরের অংশে আয়প্রভাব খুবই শক্তিশালী। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, নিম্নমজুরী স্তরে বিকল্প প্রভাব আয় প্রভাব থেকে বেশী থাকে বলে মজুরী বাড়ার সাথে সাথে শ্রমশক্তির যোগান বাড়ে এবং উঁচুমজুরীস্তরে আয়প্রভাব বেশী থাকে বলে মজুরী বাড়ার সাথে সাথে শ্রমশক্তির যোগান কমে। ফলশ্রুতিতে একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তির যোগানরেখা আগাগোড়া উর্ধ্বগামী না হয়ে ***পিছনের দিকে বাঁকা (Backward Bending)*** হয়।

এতক্ষণ আমরা একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তির যোগান রেখা দেখলাম। এভাবে যদি বাজারের সকল শ্রমিকের শ্রমশক্তির যোগানরেখাগুলোকে পাশাপাশি (Horizontally) রেখে যোগ করি তাহলে আমরা অনেকটা আগাগোড়া উর্ধ্বগামী শ্রমশক্তির যোগান রেখা পাব। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, পুরো বাজারের শ্রমের যোগান দেখানোর জন্য শ্রমশক্তির পরিমাণ ব্যবহার করব নাকি শ্রমিকের সংখ্যা ব্যবহার করব? যদিও আমরা জানি যে, উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে শ্রমশক্তি, শ্রমিক নামক মানুষটি নয়। তথাপি আমরা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বাজারের মোট শ্রমের যোগান হিসেব করার সময় **শ্রমশক্তির** পরিবর্তে **শ্রমিকের সংখ্যাকে** ব্যবহার করব। কেননা আমাদের দেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শ্রমিকদেরকে ঘন্টাপ্রতি মজুরী দেয়ার রীতি খুব একটা প্রচলিত নাই বরং সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক হিসেবে মজুরী দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া সবদেশেই একটি সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, শ্রমিকরা নির্দিষ্ট মজুরীতে প্রতিদিন ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করবে না। এ অর্থে আমরা বাজারে শ্রমের যোগানকে শ্রমিকের সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং এটা যুক্তিসংগত। চিত্র ৭.৬ এ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারে শ্রমের যোগান রেখা দেখানো হলো।

চিত্র ৭.৬ এ SS হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমের যোগান রেখা। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মাসিক মজুরীর হার যখন ১৫০০ টাকা তখন বাজারে শ্রমের যোগান হচ্ছে ৫০,০০০ অর্থাৎ ১৫০০ টাকা মাসিক মজুরীতে ৫০,০০০ জন শ্রমিক কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু ১৫০০ টাকা মাসিক মজুরীতে কাজ করতে আগ্রহী সবাই কি নিয়োগ পাবে? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে নিয়োগকর্তা বা উৎপাদকের শ্রমের চাহিদার উপর। এখন তাহলে শ্রমের চাহিদা সম্পর্কে ধারণা নেয়া যাক।

চিত্র ৭.৬: প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমের যোগানরেখা

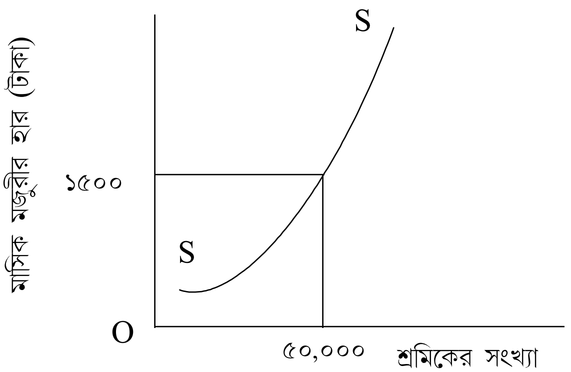

শ্রমের চাহিদা

আপনি পূর্বের পাঠটিতে জেনেছেন যে, কিভাবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতির মাধ্যমে একটি উপকরণের চাহিদারেখার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ঐ একই নীতির সাহায্যে শ্রমের চাহিদারেখা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। অন্যান্য উপকরণের ন্যায় শ্রমের প্রান্তিক রাজস্ব উৎপাদনরেখা থেকে ডানদিকে নিম্নগামী শ্রমের চাহিদারেখা নির্ণয় করা যায়। চিত্র ৭.৭ এ DD হচ্ছে শ্রমের চাহিদা রেখা।

এখন চলুন কতটাকা মাসিক মজুরীতে শ্রমবাজারে ভারসাম্য দেখা দেয় তা দেখে নিই।

শ্রমবাজারে ভারসাম্য ও মজুরীর হার নির্ধারণ

আপনি এ পাঠের প্রথমদিকে জেনেছেন যে, প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে শ্রমের যোগান ও চাহিদার মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে মজুরীর হার নির্ধারিত হয়। চিত্র ৭.৭ এ বিষয়টি দেখানো হলো।

চিত্র ৭.৭: শ্রমবাজারে ভারসাম্য

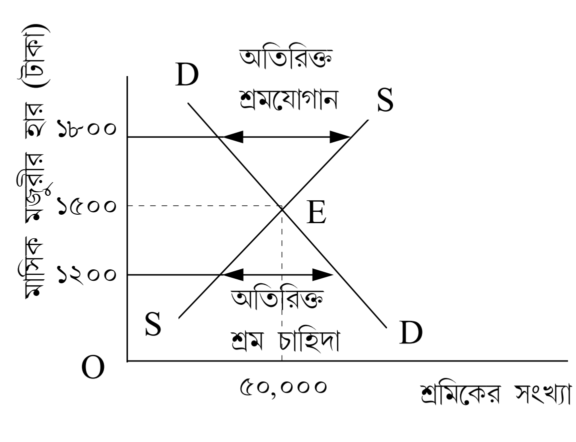

চিত্র ৭.৭ এ দেখা

যাচ্ছে E বিন্দুতে শ্রমের যোগান রেখা SS এবং শ্রমের চাহিদা রেখা DD পরস্পরকে ছেদ করেছে। ভারসাম্যাবস্থায় মাসিক মজুরী হচ্ছে ১৫০০ টাকা। আর ১৫০০ টাকা মাসিক মজুরীতে শ্রমবাজারে মোট ৫০,০০০ শ্রমিক চাকুরী পাচ্ছে অর্থাৎ ১৫০০ টাকা মাসিক মজুরীতে যতজন শ্রমিক কাজ পেতে আগ্রহী নিয়োগকর্তা বা উৎপাদকের শ্রমের চাহিদাও ঠিক তত। এখন মাসিক মজুরী বৃদ্ধি পেয়ে যদি ১৮০০ টাকা হয় তাহলে শ্রমবাজারে শ্রমের অতিরিক্ত যোগান দেখা দিবে অর্থাৎ ১৮০০ টাকা মাসিক মজুরীতে যতজন শ্রমিক কাজ করতে আগ্রহী উৎপাদকরা তার চেয়ে কমসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে চায়। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে কাজ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। এ সুযোগে উৎপাদক মজুরী কমিয়ে দিবে। এভাবে মজুরী কমতে কমতে পুনরায় যখন ১৫০০ টাকা হবে, ঠিক তখন উৎপাদকের শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান সমান হবে এবং শ্রমবাজারে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। একইভাবে, যদি কোন কারণে মাসিক মজুরী হ্রাস পেয়ে ১২০০ টাকা হয় তাহলে শ্রমবাজারে শ্রমের অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দিবে অর্থাৎ উৎপাদক ১২০০ টাকা মজুরীতে যতজন শ্রমিক নিয়োগ করতে চায় তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক ঐ মজুরীতে কাজ করতে আগ্রহী থাকে। ফলে উৎপাদকদের মধ্যে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখা দিবে। এতে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার জন্য উৎপাদকরা বেশী মজুরী হাঁকবে। এভাবে মজুরীর হার যখন পুনরায় ১৫০০ টাকায় নির্ধারিত হবে তখন শ্রমবাজারে ভারসাম্য দেখা দিবে।

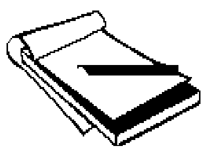

অনুশীলন

আমাদের দেশে শ্রমশক্তির অতিরিক্ত যোগান রয়েছে -এ বিষয়টির প্রমাণ হিসেবে একটি উদাহরণ দিন। তাছাড়া আমাদের দেশের শ্রমিক যদি মালয়েশিয়ায় কাজ নেয় তাহলে তাকে যে মজুরী দেওয়া হয় ঠিক একই কাজের জন্য একজন জাপানীকে বেশী মজুরী দেওয়া হয় -এর কারণ লিখুন।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

শ্রমশক্তি	শ্রমশক্তির যোগান রেখা
শ্রমবাজার	শ্রমের চাহিদা
মনোপসনি শ্রমবাজার	শ্রমবাজারে ভারসাম্য

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

১. শ্রমশক্তি বলতে কি বুঝেন? শ্রমশক্তির বিনিময়ে শ্রমিক কী পায়?

২. কোন্‌টি উৎপাদনের উপকরণ

ক. শ্রমশক্তি

খ. শ্রমিক

গ. ক ও খ উভয়ই হতে পারে

ঘ. কোনটিই নয়

৩. একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তির যোগানরেখা দেখতে কেমন হয়? একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তির যোগানের উপর মজুরী বৃদ্ধির বিকল্প প্রভাব ও আয় প্রভাবের ভূমিকা কতটুকু? ব্যাখ্যা করুন।

৪. শ্রমবাজার বলতে কি বুঝায়? শ্রমবাজারে কিভাবে ভারসাম্য দেখা দেয়? চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. শ্রমশক্তির পরিমাপের একক হচ্ছে

ক. কেজি

খ. শ্রমঘন্টা

গ. ক্যালরি

ঘ. ক, খ ও গ এর কোনটিই নয়।

৬. মনোপসনি শ্রমবাজারে

ক. একজনজন ক্রেতা থাকে

খ. একজন বিক্রেতা থাকে

গ. একাধিক ক্রেতা থাকে

ঘ. ক, খ ও গ এর কোনটিই নয়।

৭. প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা

ক. অসংখ্য (Large)

খ. অনেক (Many)

গ. স্বল্প (Few)

ঘ. ক, খ ও গ এর কোনটিই নয়।

উত্তরমালা

পাঠ- ১: ৩. খ, ৬. খ, ৭. খ,

পাঠ-২: ২. ক, ৪. খ,